প্রথম অধ্যায়

বালুরঘাটের সাধারণ পরিচয় (আর্থ-সামাজিক, ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক ও সংস্কৃতির প্রেক্ষিতে)

ইতিহাসের স্মৃতি বিজড়িত দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা। সুজলা-সুফলা এই পবিত্রভূমি নানা বৈচিত্র্যে ভরা। পৌন্ড্রবর্ধন ছাড়াও বরেন্দ্রীভূমি এই জেলার অধীনে ছিল। পাল-সেন যুগ থেকে গুপ্ত, কম্বোজ, তুর্কি, আফগান শাসন-সকলেই দিনাজপুরের মাটিকে পোক্ত করেছে। এখানকার লোক জীবনে বিভিন্ন জাতি, উপজাতি ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের নানা ভাষা, নানা পরিধান, বিভিন্ন উৎসব-অনুষ্ঠান, আর্থ-সামাজিক জীবনের সঙ্গে যে মিশ্রণ ও সমন্বয় ঘটিয়েছে তা এক সংহতির বন্ধনে আবদ্ধ করেছে। আর এখানে গড়ে উঠেছে এক মিশ্র সংস্কৃতি। দক্ষিণ দিনাজপুরের জেলা শহর বালুরঘাট- স্বাধীনতা আন্দোলন, তে-ভাগা আন্দোলন, শরণার্থীদের আশ্রয়দান-কোন বিষয় থেকে পিছুপা হয়নি। সঙ্গে তার সংস্কৃতির জগতে বিচরণ-সাহিত্য, সঙ্গীত, পত্রপত্রিকা, খেলাধুলা, লোকসাহিত্য কোন বিষয় বাদ দেওয়া যায় না বালুরঘাটের ইতিহাস থেকে। বালুরঘাট মহকুমা গঠন (১৯০৪) এরপর থেকে বিভিন্ন পেশার জন্য সম্ভ্রান্ত লোকের বাসভূমি হয়ে ওঠে বালুরঘাট এবং শিল্প সাহিত্যে বিশেষ করে নাট্যশিল্পের প্রাণ প্রতিষ্ঠা পায়।

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট শহরের ঐতিহাসিক পরিচয় জানতে গেলে আমাদের অবিভক্ত দিনাজপুর জেলার ইতিহাস সম্পর্ক্যে কিছু ধারণা থাকা দরকার। অবিভক্ত দিনাজপুর বরেন্দ্রভূমির অন্তর্গত। গুপ্তযুগে বাংলা প্রধান দুটি রাষ্ট্রীয় ভাগে বিভক্ত ছিল-পুন্ড্রবর্ধন ভুক্তি এবং বর্ধমান ভুক্তি। বরেন্দ্র ভূমি প্রাচীন পুন্ড্রবর্ধনের এক বৃহৎ অংশ। পুন্ড্রবর্ধন খ্রিষ্ট্রীয় পঞ্চম শতক থেকে শুরু করে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত বাংলার গৌরব ও মর্যাদার কেন্দ্রবিন্দু ছিল। ভুক্তির নিম্নতর স্তর ছিল বিষয় বা জেলা। ''পুন্ড্রবর্ধন ভুক্তি দুটি বিষয়ে বিভক্ত ছিল যথা কোটিবর্ষ বিষয় ও পঞ্চন নগরী বিষয় এই দুটি বিষয় ভৌগোলিক অবস্থানগত দিক থেকে দিনাজপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত।''[১] কোটি বর্ষের অবস্থান ছিল পুনর্ভবা নদীর তীরে এবং করতোয়া ও যমুনা নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত ছিল পঞ্চনগরী। দিনাজপুরকে কেন্দ্র করে শিল্প সংস্কৃতির এক অধ্যায় সূচিত হয়। ভারত স্বাধীনতা লাভের পূর্ব পর্যন্ত দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা ছিল অবিভক্ত দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত। ''দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় মৌর্য, গুপ্ত, কম্বোজ, শুঙ্গ, পাল, সেন থেকে মুসলিম তথা বৃটিশরা রাজত্ব করেছেন। আর দিনাজপুর নাম মুসলমান শাসনের অবদান।''[২] 'ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে দিনাজপুর নামটির প্রচলন হয় এবং ঘোড়াঘাটের গুরুত্ব কমে গিয়ে ক্রমে দিনাজপুর উন্নত জনপদ ও দিনাজপুর রাজ্যের শাসন কেন্দ্রে পরিণত হয়। ১৭৬৫ খ্রী: ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর অধীনভুক্ত হয়। ১৭৬৯খ্রী: দিনাজপুর সদরে এসে উপস্থিত হন প্রবল প্রতাপশালী ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর তত্ত্বধায়ক এইচ. কটরেল এবং সেই সঙ্গে সূচিত হয় দিনাজপুর জেলার ইংরেজ শাসনের গোড়াপত্তন। ১৭৮৬ খ্রী:

ইংরেজ কালেক্টর জর্জ হ্যাচের (G.Hatch) আগমনে শুরু হয় দিনাজপুর জেলার জয়যাত্রা''।[৩]

প্রাচীনকালে দিনাজপুর অঞ্চল ছিল পৌন্ড্রবর্দ্ধন রাজ্যভুক্ত। দিনাজপুর জেলার নামকরণ সম্পর্কে নানা মতভেদ রয়েছে। ''সামন্ততন্ত্রের আমলে 'দিনরাজ' নামে একজন রাজা অখন্ড দিনাজপুরে বসবাস করতেন এবং তাঁর নামেই দিনাজপুর নামের প্রচলন''[৪]। ''কেউ কেউ বলেন মুসলমান অধিকারের যুগে একজন হিন্দু জমিদার নি:শব্দে ক্ষমতা সঞ্চয় করে নিজেকে গৌড়ের স্বাধীন রাজা বলে ঘোষণা করেছিলেন। এই হিন্দু জমি জমিদার ছিলেন দিনাজপুরের প্রভাবশালী ভূ-স্বামী রাজা গণেশ। তিনি দনুজমর্দন দেব নাম ধারণ করেন। ফার্সি পন্ডিতেরা 'দনুজ' শব্দটি উচ্চারণ করতেন 'দিনওয়াজ' রূপে; শব্দটি ক্রমে বিবর্তিত হয়ে দাঁড়ায় 'দিনওয়াজ'। সতের শতকে মুসলিম শাসকেরা 'দিনওয়াজ' শব্দটিকে বেছে নেন, যার বাংলা 'দিনাজ' তার সঙ্গে 'পুর' যোগ করে স্থানটি দিনাজপুর নামে পরিচিত হয়।''[৫] কেউ কেউ বলেন 'যোজন ব্যাপী দারিদ্র্য' লক্ষ্য করে এই স্থানের নামকরণ হয় 'দীনজনপুর'। এই দীনজপুর লোকমুখে প্রচলিত হতে হতে বর্তমানে 'দিনাজপুর' নামে পরিচিত হয়।

১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের পূর্বে দিনাজপুর জেলা দিনাজপুর সদর, ঠাকুরগাঁ, বালুরঘাট নিয়ে গঠিত হয়েছিল। ভারত স্বাধীন হলে র‍্যাডক্লিফের সীমানা বিভাজন নীতি অনুসারে দিনাজপুর জেলা দ্বিখন্ডিত হয়। ''অবিভক্ত বাংলার দিনাজপুর জেলার পশ্চিম সীমানায় অবস্থিত এলাকা সমূহ নিয়ে পশ্চিম দিনাজপুর জেলার সৃষ্টি হয়। সৃষ্টি কালে ছিল একটি মাত্র মহকুমা যার মধ্যে তপন, গঙ্গারামপুর, বালুরঘাট, কুমারগঞ্জ এবং হিলি থানা ছিল। ..... ১৯৪৮ সালে জুলাই মাসে রায়গঞ্জ, হেমতাবাদ, কালিয়াগঞ্জ, কুশমন্ডি, বংশীহারী এবং ইটাহার থানা নিয়ে রায়গঞ্জ মহকুমার সৃষ্টি হয়। ১৯৫৬ সালের মার্চ মাসে জেলার পরিধির আবার পরিবর্তন ঘটে। চোপড়া, ইসলামপুর, গোয়ালপোখর এবং করণদিঘী থানা নিয়ে ইসলামপুর মহকুমার সৃষ্টি হয়। ১৯৬৪ সালের জানুয়ারী মাসে গোয়ালপোখর থানা গোয়ালপোখর ও চাকুলিয়া থানা দুটিতে বিভক্ত হয়। পরবর্তীকালে হরিরামপুর থানার মর্যাদা লাভ করায় জেলার তিনটি মহকুমায় থানার মোট সংখ্যা হয় ১৭''[৬] বৃহৎ পশ্চিম দিনাজপুর জেলার প্রশাসনিক কাজের সুবিধার জন্য পশ্চিম দিনাজপুর আবার বিভাজন করা হল। ১৯৯২ সালের ১লা এপ্রিল পশ্চিম দিনাজপুর জেলার দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত বালুরঘাট মহকুমার অর্থাৎ পশ্চিম দিনাজপুর জেলার এক তৃতীয়াংশ নিয়ে গঠিত হল দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা। দক্ষিণ দিনাজপুর গঠন কালে ১টি মহকুমা(বালুরঘাট) ও আটটি থানা (বালুরঘাট, হিলি, কুমারগঞ্জ,তপন, গঙ্গারামপুর, বংশীহারী, কুশমন্ডি এবং হরিরামপুর)। বর্তমানে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার ২টি মহকুমা, (বালুরঘাট ও গঙ্গারামপুর মহকুমার) এবং তিনটি পৌরসভা (বালুরঘাট পৌরসভা, গঙ্গারামপুর পৌরসভা ও বুনিয়াদপুর পৌরসভা) ২০১১ সালের জনগণনা অনুসারে দক্ষিণ দিনাজপুর পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে কম জনসংখ্যা বিশিষ্ট জেলা। দক্ষিণ দিনাজপুরের জেলা শহর 'বালুরঘাট'।

দক্ষিণ দিনাজপুরের ভৌগোলিক অবস্থান পশ্চিমবঙ্গের উত্তর-পূর্ব দিকে। জেলাটির প্রায় পুরোটাই বাংলাদেশ সীমানা দ্বারা আবৃত, আপাতদৃষ্টিতে দেখলে মনে হয় বাংলাদেশরই অন্তর্গত একটি জনপদ। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাগত অবস্থান যথাক্রমে

$26^0$36'N-$25^0$10'N এবং $89^0$00'30''E জেলাটির উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্ব দিকে বাংলাদেশ সীমানা এবং দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্তে রয়েছে উত্তর দিনাজপুর ও মালদা। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার আয়তন ২২১৯ বর্গকিমি। পূর্ব-পশ্চিমে এই জেলার দৈর্ঘ্য প্রায় ৮০ কিমি ও উত্তর দক্ষিণে প্রায় ৪২ কিমি। ভারত ও বাংলাদেশের ২৫২ কিমি সীমান্ত এলাকা দক্ষিণ দিনাজপুরের মধ্য দিয়ে গেছে।

দক্ষিণ দিনাজপুরের জেলাসদর বালুরঘাট অবিভক্ত পশ্চিম দিনাজপুরেরও প্রধান শহর, বানিজ্যকেন্দ্র এবং সংস্কৃতির পীঠস্থান হিসেবে পরিচিত ছিল। ভৌগোলিক অবস্থান অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাগত বিচারে যথাক্রমে $25^0$22'N- $88^0$76'E। ২০১১ সেন্সাস অনুসারে বালুরঘাট শহরের জনসংখ্যা ১৬,৭০,৯৩১ জন এবং সাক্ষরতার হার ৭৩.৮৬ শতাংশ (প্রায়) যা জাতীয় স্বাক্ষরতার হারের (৫৯.৫ শতাংশ) তুলনায় অনেক বেশী। বালুরঘাট শহরের প্রায় মাঝবরাবর প্রবাহিত হয়েছে আত্রেয়ী নদী।

বালুরঘাট থানা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৮৬ খ্রী:। ''কোম্পানী আমলে বালুরঘাট বলে কোনও গ্রাম ছিল না। ১৮৮৬ খ্রী: চক্ভবানী এলাকায় সরকার একটি মুন্সেফ চৌকি স্থাপন করেন এবং তার পরেই ইংরেজদের কাগজপত্রে বালুরঘাটের নামটি পাওয়া যায়। ১৯০৪ খ্রী: মহকুমা হিসাবে বালুরঘাট মহকুমার আত্মপ্রকাশ ঘটে''[৭]। বালুরঘাটের আয়তন ৩৬৩.৯০ বর্গকিলোমিটার। ১১টি গ্রাম পঞ্চায়েত নিয়ে বালুরঘাট থানা গঠিত। মুনসেফী চৌকি প্রতিষ্ঠার পূর্বে এই স্থানের নাম ছিল 'বলহরঘট্ট'। খানা, বিল, নদী, নালা, খাড়ির সঙ্গে জঙ্গলে ঢাকা ছিল এই গ্রাম। সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত' কাব্যে রামাবতীর কিছু দূরে বিপুলতটার তীরে একটি প্রাচীন জলপথ ছিল। বিস্তীর্ণ বালুকাময় তীরে ওই জলপথের পরিবর্তিত নামই বালুরঘাট নামে পরিচিত হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। আত্রাই নদীর ঘাট ও বালুর আধিক্য থেকেই ব্রিটিশরা সম্ভবত 'বলহরঘট্ট' নাম পরিবর্তন করে বালুরঘাট নামকরণ করে এবং এই ভাবেই বালুরঘাটের নাম হয়েছে বলে কেউ কেউ বলেন। আবার এটাও প্রচলিত যে বহুদিন পূর্বে নদীর ঘাট ছিল এখন যেখানে বাইড়া (বয়ড়া) কালীতলা এবং ঘাট কালীতলা। নদীর গতিপথ পরিবর্তনের সঙ্গে এই দুটি ঘাট পরিত্যাক্ত হয়ে বুড়া কালীতে পরিবর্তন হয়। বাইড়া কালী অথবা বয়ড়া কালী নামটির অপভ্রংশ রূপ বুড়াকালী। লোকমুখে স্থানের নাম উচ্চারিত হতে থাকে বয়ড়ারঘাট তা থেকে বালুরঘাট।

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার জলবায়ু উষ্ণ ও আর্দ্র। আত্রেয়ী, পুনর্ভবা, টাঙ্গন, যমুনা, ইছামতী, ব্রাহ্মণী ও শ্রীমতি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাকে সমৃদ্ধ করেছে। আত্রেয়ী নদী সম্পর্কে নীহার রঞ্জন রায় বলেছেন-''সপ্তদশ শতকে করতোয়া (এবং আত্রাইও) উল্লেখ যোগ্য নদী। অষ্টদশ শতকে রেনেলের নক্শায়ও আত্রাই এবং করোতোয়ার সেই মোটামুটি সমৃদ্ধ রূপ দৃষ্টিগোচর হইতেছে, ... কিন্তু ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দের হিমালয় সানুর বিরাট বন্যায় আত্রাই - করতোয়ার সমৃদ্ধির বিনষ্ট হইয়া গেল।''[৮] আত্রাই ও তৎসংলগ্ন অংশ নদী অধ্যুষিত জেলা হলেও বর্তমানে জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারণ ও প্রতিবেশী বাংলাদেশের আত্রাই উপর নির্মিত বাঁধ নদীগুলিকে প্রায় মজে যাওয়া নদীতে পরিণত করেছে। বর্ষাকাল ব্যতীত বছরের অন্যান্য সময় প্রায় জলশূন্য থাকায় কৃষিতে জলসেচ ও পানীয় জলের অভাব দেখা যায়।

জেলাটি বরেন্দ্রভূমির অন্তর্গত প্রাচীন ও নবীন পলিদ্বারা গঠিত, সামান্য ঢেউ খেলানো এবং জলাভূমি যুক্ত। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় দু'ধরণের মাটি পাওয়া যায়-গৈরিক ও নবীন পাললিক। বাংলার পশ্চিমাংশে পুরাতন ভূমির অর্থাৎ গলিত আগ্নেয় শিলার দ্বারা গঠিত যা রাজমহল থেকে উত্তর গঙ্গা পার হয়ে মালদহ, রাজশাহী, দিনাজপুর ও রংপুর বগুড়ার মধ্য দিয়ে ব্রহ্মপুত্র অতিক্রম করে আসামের শৈলশ্রেণী পর্যন্ত বিস্তৃত। এই অঞ্চলের ভূমি গৈরিক ও স্থূল বালুকাময়। এই গৈরিক ভূমি দেখতে পাওয়া যাবে রংপুরের পশ্চিমাংশে বগুড়া, রাজশাহীর উত্তরাংশ ও দিনাজপুরের পূর্বাংশে''[৯]।

বরেন্দ্রীর গৈরিক ভূমি অনুর্বর কিন্তু এর বেশির ভাগই ঢেকে গেছে আত্রাই, মহানন্দা, কুশী, পদ্মা, পুনর্ভবা ও করতোয়ার পালল মৃত্তিকায় গঠিত নবভূমি দ্বারা। ক্ষীয়মান পুরাতন ভূমির রেখাটুকু ছাড়া নবগঠিত সকল অংশই সমতল উর্বর ও শস্যশ্যামলা। এই সমতলের মাটি আবার দু'ধরণের -উত্তরার্ধের মাটি ছাই রং এর বেলে দোঁয়াশ, দক্ষিণার্ধের মাটি এঁটেল মাটি। এখানে সর্বত্র সমান বৃষ্টি পাত হয় না। এই জেলার বাৎসরিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমান ১৬৯০ মিলিমিটার। সর্ব্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে ৩৮.২°- ৫.২° সেলসিয়াস।

দিনাজপুর অঞ্চল অতি প্রাচীনকাল থেকেই সমৃদ্ধ ও জনবসতিপূর্ণ। নৃতত্ত্বের দিক থেকেও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। প্রাগৈতিহাসিক যুগে উত্তর ভারতের হিমালয় পাদদেশ সন্নিহিত অঞ্চলের মোঙ্গল জাতিগোষ্ঠীর বসতি দিনাজপুর জেলার উত্তরাঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় জন বিন্যাসে বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। এখানকার জনবসতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কৈবর্ত, মাহিষ্য, রাজবংশী ও আদিবাসী গোষ্ঠী ভুক্ত। এছাড়া মুসলমান ও খ্রীষ্টানও রয়েছে। আদিবাসীদের মধ্যে খ্রীষ্টানধর্ম গ্রহণ করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। পলিয়া নামে একটি জনগোষ্ঠী আছে। উত্তরবঙ্গের মধ্যে তথাকথিত পশ্চিম দিনাজপুরে পলিয়ার আধিক্য রয়েছে। পলিয়া বস্তুত প্রাচীন বোড়ো জনগোষ্ঠীর একটি অংশ বিশেষ। রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমিতির প্রচার এবং প্রসারের ফলে পলিয়া জনগোষ্ঠীর অনেকেই রাজবংশীর অন্তর্ভুক্ত হয়। দেশ বিভাগের ফলে প্রচুর মানুষ ভারত থেকে পাকিস্থান গেছে, আবার পাকিস্থান থেকে ভারতবর্ষে এসেছে। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার চারিদিকে রয়েছে বাংলাদেশ। তাই এখনও পর্যন্ত প্রচুর বাংলাদেশী দক্ষিণ দিনাজপুরের গ্রাম-গঞ্জে বসতি স্থাপন করছে। জেলায় বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মানুষের বসবাস থাকলেও বালুরঘাট সদর হিন্দু প্রধান।

দক্ষিণ দিনাজপুরের ভাষা বাংলাভাষা। কিন্তু এখানে ব্যবহৃত বাংলাভাষার উপভাষার বৈচিত্র্য আছে। এই জেলার পূর্ব দিকে আছে দিনাজপুর, দক্ষিণ পূর্বে বগুড়া রাজসাহী ও মালদা। এই অঞ্চল গুলি বরেন্দ্রী উপভাষার অঞ্চল। তাই বরেন্দ্রী উপভাষার সঙ্গে দক্ষিণ দিনাজপুরের উপভাষার সাদৃশ্য দেখা যায়। দক্ষিণ দিনাজপুরের আদি বাসিন্দাদের মধ্যে মূলত রাজবংশী সম্প্রদায় প্রায় সর্বত্রই ছড়িয়ে আছে। তপন, গঙ্গারামপুর ও কুমারগঞ্জ থানায় রাজবংশী সম্প্রদায় খুব বেশী। তবে উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় আদিবাসীও রয়েছে। মুসলমান সম্প্রদায় রয়েছে, রয়েছে কিছু সংখ্যক হিন্দি ভাষী জনসাধারণ। ফলে এখানকার জনসমাজ যথাক্রমে বাংলা, উর্দু, সাঁওতালী, মুন্ডারী, কুরুক ও হিন্দি ভাষা ব্যবহারকারী। ''ভাষার গোষ্ঠীগত পরিচয়ের দিক থেকে উত্তবঙ্গের উপভাষা 'কামরূপী'র অঙ্গরূপেই পশ্চিম দিনাজপুরের ভাষাকেও নির্দেশ করতে হয়, যেহেতু এই উপভাষার কতকগুলি সাধারণ

বৈশিষ্ট্য ঐ উপভাষায় নিহিত আছে।''[১০]

১৯৪৭ সালের দেশ ভাগের পূর্বে ও পরে পূর্ব পাকিস্থানের বহু মানুষ দক্ষিণ দিনাজপুরের (তৎকালীন পশ্চিম দিনাজপুর) গ্রাম গঞ্জে আসে, সেই সঙ্গে বালুরঘাট শহরেরও প্রচুর পূর্ব পাকিস্থানের মানুষ এসেছিল এবং বর্তমান কাল পর্যন্ত বাংলাদেশের হিন্দু সম্প্রদায় আসছে। ফলে এখানে প্রচলিত উপভাষার মধ্যে পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। বহিরাগত ব্যক্তিদের মুখের ভাষায় কামরূপীর বদলে বঙ্গালীর ও বরেন্দ্রীর মিশ্রণ ঘটেছে। অনেকে আনুষ্ঠানিক পরিস্থিতিতে রাঢ়ী উপভাষায় কথা বলার চেষ্টা করে অন্য দিকে স্থানীয় কামরূপীদের সঙ্গে কামরূপী ব্যবহার করে। ফলে বালুরঘাট সহ দক্ষিণ দিনাজপুরের বাংলা উপভাষায় নানান মিশ্রণ ঘটেছে।

দক্ষিণ দিনাজপুরের বিশেষ করে বালুরঘাটের মৌখিক ভাষার যে বৈচিত্র্য তার কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া গেল।

ঘটমান বর্তমানকালে ক্রিয়াপদ- যাচ্ছে>যাছে

করিতেছে>করতিছি

কোথাও কোথাও ক্রিয়াপদের মধ্যে 'ইচ' এর আগমন দেখা যায়-

সে করছে>অঁই করিচ্ছে

সে আসছে>অঁই আসিচ্ছে।

মধ্যম পুরুষ ক্রিয়াপদের শেষে অতীত কালে অতিরিক্ত 'স' যোগ হয় -

তুই আমটা খেয়েছিলি?>

তুই আমটা খেয়েছিলিস?

'চেয়ে' 'থেকে' অনুসর্গগুলি 'চায়া' থাকি' অনুসর্গ প্রচলিত-

তুমি কোথা থেকে এলে> তুই কুনঠে থাকি আসিলো

এই অঞ্চলে নির্দেশক 'টা' পদের ব্যবহার 'ডা' রূপে হয়ে তাকে। কখনো কখনো 'টা'র পরিবর্তে 'কনা' বা 'কোনো' ব্যবহার করা হয়।

দুটা>দুকনা

তিনটা>তিনকোনা

জেলাটি মূলত কৃষিনির্ভর। এখানের মাটি খুব উর্বর। শস্য-শ্যামলা বাংলাদেশ বলতে আমরা যাকে বুঝি তার অংশ বিশেষ এই দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা। নদীবিধৌত পলিমাটি খুব উর্বর এবং সব ধরণের ফসল চাষের উপযোগী। মাটি সামান্য অম্ল ভাবাপন্ন হওয়ায় ধান খুব ভলো হয়। বালুরঘাট মহকুমায় প্রচুর পরিমানে ধান, কাঁঠাল, পটল উৎপন্ন হত এবং খুবই সুলভ মূল্যে মাছ, দুধ, চাল, ডাল, শাক-সব্জী মিলত। সাধারণ ভাবে মহকুমার উদ্বৃত্ত ফসল বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে রপ্তানী হত এবং বর্ষাকালে মহাজনেরা নৌকাযোগে বালুরঘাটে এসে ধানচালের সঙ্গে কাঁঠাল, পটল ইত্যাদী নৌকা ভর্তি সওদা করে নিয়ে যেতো। ''এই থানার আত্রাই নদী তীরে একটি উন্নত বানিজ্য বন্দর গড়ে ওঠে। এখানকার সুগন্ধ চাল ভারত ও ভারতবর্ষের বাইরে চালান যেত। তাছাড়া এখানকার উর্বরা জমিতে পাট ও আখের চাষ ভাল হত''।[১১] ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগ এবং ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্থানের মুক্তিযুদ্ধ ও

বাংলাদেশের জন্ম এই জেলায় প্রভূত উদ্বাস্তু সমাবেশ ঘটায় এবং এই জেলার কৃষিনির্ভর অর্থনীতির উপর প্রভূত চাপ সৃষ্টি হয়। কৃষিজীবি মানুষ ছাড়াও সরকারী চাকরী ও ক্ষুদ্র খুচরো ব্যবসা এই অঞ্চলের অর্থনীতির প্রধান উৎস। তবে এই জেলায় প্রচুর মাছ চাষ হয়। জেলার অর্থনীতিতে মাছ চাষের ভূমিকা রয়েছে যথেষ্ট।

দক্ষিণ দিনাজপুরের প্রধান খাদ্য ভাত। রুটি দ্বিতীয় খাদ্য। বেশকয়েকটি নদী ও জলাভূমি থাকার জন্য এখানে মাছই প্রধান প্রোটিন জাতীয় খাদ্য। তাছাড়া মাংস ডিম এর যথেষ্ট প্রচলন রয়েছে।

শিল্পবিহীন ও কম যানবাহন থাকায় সাধারণ ভাবে দূষণ সংক্রান্ত রোগের প্রবণতা কম। তবে এই জেলা বন্যাকবলিত হওয়ায় জলবাহিত রোগ যেমন-আমাশয়, কলেরা, টাইফয়েড, রোগের প্রকোপ বেশি। দক্ষিণ দিনাজপুরের জনস্বাস্থ্যের উপর বেশি আঘাত হেনেছে বিভিন্ন নেশার বস্তু। মদ, গাঁজা, চোলাই মদ প্রথম সারিতে রয়েছে। বেশ কতকগুলি Foreign Liquor Shop এবং Country Liquor Shop রয়েছে। তাছাড়া প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশ থেকে বিভিন্ন মাদক দ্রব্য এই জেলার প্রায় সর্বত্রই ব্যবহৃত হয়। এছাড়াও বিভিন্ন গ্রামে সরকারী হিসাব বহির্ভূত মাদক দ্রব্য গ্রাম্য প্রথায় তৈরি হয়ে বিভিন্ন হাটে বিক্রি হয়। আবগারী দপ্তরের মতে বেসরকারী ভাবে মরফিন ও হেরোইনের প্রসার ঘটেছে। জেলার জনস্বাস্থ্য রক্ষার্থে বালুরঘাট শহরে রয়েছে-

সদর হাসপাতাল
গ্রামীন হাসপাতাল (R.H.) - ১টি (হিলি)
মহকুমার হাসপাতাল - ১টি (গঙ্গারামপুর)
ব্লক হালপাতাল (P.H.C) - ৭টি
প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র (B.P.H.C.) - ১৯টি
উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র (Sub-Centre) - ২০৮টি

এছাড়াও এই জেলার জনস্বাস্থ্য রক্ষার্থে সেন্টজন্স এম্বুলেন্স, রেডক্রস সোসাইটি, প্রয়াস আত্রেয়ী, রোটারী ক্লাবের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চ তাদের বিভিন্ন আলোচনার মাধ্যমে এই জেলার বিভিন্ন গ্রামে মানুষের মধ্যে স্বাস্থ্যের চেতনা বৃদ্ধিতে বিশেষ কাজ করে চলেছে।

সবযুগেই মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতির রূপ দিয়েছে তাঁর শিক্ষা ব্যবস্থা। সমাজে সুস্থভাবে বাস করতে হলে সাংস্কৃতিক চাহিদার পরিতৃপ্ত প্রয়োজন এবং এই চাহিদা মেটাতে সক্ষম একমাত্র শিক্ষা। শিক্ষাই সমাজ গড়ে। শিক্ষা শিশুর বা শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত শক্তি বা সম্ভবনা প্রকাশ করে। দক্ষিণ দিনাজপুর প্রাচীন কালে কৌটিবর্ষ ও পুন্ড্রবর্ধন এর অন্তর্গত। ‘‘গুপ্ত বংশের রাজত্বকালে যে সাংস্কৃতিক বিপ্লব ভারতবর্ষে ঘটেছিল তাঁর ছোয়া পুন্ড্রবর্ধন ভূক্তি অঞ্চলেও লেগেছিল। সেই সময় শিক্ষিত মানুষ মাত্রই সংস্কৃত জানতেন।’’[১২]

‘‘আর্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি উত্তর বিহার থেকে পূর্ব দিকে সংলগ্ন দিনাজপুর জেলায় প্রথম প্রবেশ করে। ধীরে ধীরে সমগ্র বঙ্গ দেশে আর্যায়ন ঘটে। এদিক থেকে দিনাজপুর জেলা

আর্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির আগমনের প্রবেশদ্বার।''[১৩] এই সময় থেকেই দিনাজপুর জেলায় বৌদ্ধ ধর্ম প্রভাব বিস্তার করে। পালযুগে কতক গুলি বিহার ও মহাবিহার গড়ে ওঠে। দেশভাগের পর পশ্চিম দিনাজপুর তথা দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় পড়ে সেগুলি হল জগদ্দল মহাবিহার, পতিরাজ দেহাবন্দ বিহার, মৃগশিখা বিহার, দেবকোট বিহার, পাল যুগে এই সব বিহার বৌদ্ধ শিক্ষা প্রসারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল। পাল যুগের শেষের দিকে খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছেছিল জগদ্দল মহাবিহার। জগদ্দল মহাবিহারের অবস্থান নিয়ে বিতর্ক আছে। অনেকে বলেছে- দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বংশীহারী থানার জগদ্দল ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে জগদ্দল মহাবিহারের অবস্থান ছিল। পন্ডিত অতীশ দীপঙ্কর নাকি দেবকোট বিহারে শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। ''বর্তমান দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর থানার ধলদিঘীর পাশেই অবস্থিত দেবকোট বিহার। তৎকালীন বৌদ্ধ পন্ডিত অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান এই দেবকোট বিহারেই তাঁর শিক্ষাজীবন শুরু করেছিলেন।''[১৩]

দ্বাদশ শতকের শুরুতে মহম্মদ বখতিয়ার খিলজি লক্ষ্মণ সেনকে পরাজিত করে উত্তরবঙ্গের ক্ষমতা হস্তগত করেন এবং দেবকোটে সেনা ছাউনি স্থাপন করেন। তিনি দেবকোটে মাদ্রাসা ও মুক্তব স্থাপন করেন। বখতিয়ার খিলজী এই জেলায় প্রথম মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু করেন। নবাবী আমলে প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হত গ্রামীন পাঠশালা ও সংস্কৃত পাঠ দেওয়া হত চতুষ্পাঠীতে। ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণে আকর্ষণ লক্ষ্য করার মত। সন্ধ্যাকর নন্দী (রামচরিত), জগজ্জীবন (মনসামঙ্গল), নাটককার মন্মথ রায়, ভাটনগর পুরস্কার প্রাপ্ত তাপস কুন্ডু এই জেলারই কৃতি সন্তান।

দক্ষিণ দিনাজপুরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ২০১১ এর পরিসংখ্যান অনুসারে-

প্রাথমিক বিদ্যালয়	-	১১৯০টি
উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়	-	৬৪টি
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	-	৮২টি
জুনিয়ার হাইস্কুল	-	৩টি
নিউসেটআপ স্কুল	-	১৩৬টি
এস.এস.কে.	-	৫৩১টি
এম.এস.কে.	-	৩৯টি
হাই মাদ্রাসা	-	১২টি
সিনিয়র মাদ্রাসা	-	১২টি
মহাবিদ্যালয়	-	৭টি
কারিগরি মহাবিদ্যালয়	-	১টি
আইন মহাবিদ্যালয়	-	১টি
উত্তরবঙ্গ কৃষিবিশ্ববিদ্যালয়		
বি. এড. কলেজ	-	৮টি

প্রতিবছর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বেড়েই চলছে।

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় ৬৫৭টি গ্রন্থাগার আছে। হিলির রায়সাহেব কুমুদনাথ দাস

১৮৯৬ খ্রী: জেলায় প্রথম গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেন। জেলা গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা হয় ১৯১৪ সালে।

জেলার পরিবহন ব্যবস্থা মূলত সড়কপথের ওপরই নির্ভরশীল ছিল। ২০০৪ সালে বালুরঘাটে রেল পথের প্রচলন হয়। ''বালুরঘাটে একটি স্থায়ী বিমান অবতরণ ক্ষেত্র ও ১৯৫০ সাল নগদ তৈরী হয়। বেসরকারী এজেন্সীর মাধ্যমে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত এই ব্যবস্থা চালু ছিল পরে সরকারী ব্যবস্থার মাধ্যমে দুবার চালু করা হলেও তা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি।''[১৫] বর্তমানে বিমান ক্ষেত্রের কিছু জমি বেদখল হয়ে গেছে। অতি সম্প্রতি বালুরঘাট-মালদা-কলকাতা রুটে হেলিকপ্টার পরিষেবা চালু হয়েছে। জল,স্থল, অন্তরীক্ষ এই তিন পথই পরিবহন ব্যবস্থা চালিত হয়। দক্ষিণ দিনাজপুরের জল পথের ব্যবহার খুব কম, জল পথে মানুষের নির্ভরশীলতা নেই। তাছাড়া যে নদীগুলির সঙ্গে দক্ষিণ দিনাজপুরের মানুষের জীবন অঙ্গাঙ্গী জড়িত সেই সব নদী আজ নানা সমস্যার সম্মুখীন। দক্ষিণ দিনাজপুর দিয়ে প্রবাহিত নদীগুলির নাব্যতা নেই। তাছাড়া নদীগুলির সীমারেখা জল পথ পরিবহনের উপযোগী নয়। জেলা পরিবহন মূলত সড়কপথ নির্ভর, তবে এ জেলার উপর দিয়ে কোন জাতীয় সড়কের বিস্তার নেই।

বড় মাপের শিল্প গড়ে ওঠেনি দক্ষিণ দিনাজপুরে। এখানে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত ছিল না তাই হয়ত কোনো শিল্প গড়ে ওঠেনি। যদিও বর্তমান কোলকাতা শিলিগুড়ির সঙ্গে ট্রেন যোগাযোগ শুরু হয়েছে তবুও শিল্পের কোনো সম্ভাবনা এখনও দেখা যাচ্ছে না। তবে জেলা জুড়ে মাঝারী ও কুটির শিল্প ছড়িয়ে রয়েছে। প্রাক্-স্বাধীনতা পূর্বে হিলি চালের মিলের জন্য বিখ্যাত ছিল। দেশভাগের ফলে হিলির চালের মিল সমেত রেলস্টেশন পূর্ব পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত হয়। তাঁত শিল্প, বিড়ি শিল্প, চাল-চিড়ার মিল রয়েছে। বাঁশ শিল্পে কুশমন্ডীর সুনাম আছে। বাঁশের মূর্তি, ফুলদানী, ফুলের সাজি, টেবিল তৈরি হয় যা ঘর সাজানোর সৌখিন আসবাবপত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়। দক্ষিণ দিনাজপুরের কারু শিল্পের মধ্যে উল্লেখযোগ্য- কাঠের মুখোশ, কাঠের পুতুল, কাঠের মন্ডব, পুতুল নাচের পুতুল, গাছা, প্রদীপ ইত্যাদি। গম্ভীরা, কালীনৃত্য ও গাজনে কাঠের মুখোশ ব্যবহৃত হয়। গঙ্গারামপুরে তাঁত শিল্প ছাড়াও স্টিল ফার্নিচারের শিল্প দক্ষিণ দিনাজপুরের অর্থনীতিতে প্রভাব ফেলেছে।

উত্তরবঙ্গের ছোটো জেলা দক্ষিণ দিনাজপুরের সাংস্কৃতিক বাতাবরণ বেশ সুগঠিত। এখানকার সংস্কৃতির একটা বড় অংশ জুড়ে রয়েছে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন যা বাংলার ঐতিহ্যকে সমৃদ্ধশালী করে তুলেছে। গঙ্গারামপুরের বাণগড়ে পাওয়া গেছে প্রাচীন স্থাপত্য, ভাস্কর্য, মুদ্রা, পোড়ামাটির লেখ, বাসন, বিভিন্ন লিপি, পরিখাবেষ্ঠিত দেবকোট নগরী ইত্যাদি। দশম শতাব্দীতে খোদিত কম্বোজ রাজার দিনাজপুর স্তম্ভ লিপি এবং একাদশ শতকের প্রথম মহীপালের তাম্রপত্র বাণগড় ধ্বংসস্তুপ থেকে পাওয়া গিয়েছে। প্রথম মহিপালদেবের তাম্রলিপি সম্পর্কে রাখাল দাস বন্ধ্যোপাধ্যায় বলেছেন-''নারায়ণ পাল সম্ভবত পঞ্চান্ন বছর রাজত্ব করিয়া দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন। নারায়ণ পালের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র রাজ্যপাল গৌরবঙ্গের সিংহাসন লাভ করেছিলেন। দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত বাণগরে আবিস্কৃত প্রথম মহিপাল দেবের তাম্রশাসন হইতে অবগত হওয়া যায় যে, রাজ্যপাল বহু গভীর জলাশয় এবং উচ্চ দেবালয় নির্মাণ করিয়া কীর্ত্তিলাভ করিয়াছিলেন।''[১৬] ''দশম শতাব্দীতে খোদিত কম্বোজ রাজার দিনাজপুর স্তম্ভ লিপি এবং একাদশ শতকে প্রথম মহিপালের তাম্রপত্র বাণগড় ধ্বংসস্তুপ

থেকে পাওয়া গিয়েছে মদন পালের দু'টি তাম্রপত্র বাণগড় থেকে সংগৃহীত হয়েছে।''[১৭] মদন পালের তাম্রপত্র থেকে জানা যায় মদন পাল আনুমানিক ১১৪৩ খ্রি: হলাবর্ত মন্ডলের (তপন থানার মানাহালি অঞ্চল) অন্তর্গত বুধবার গ্রামটি মুরারীপুরাত দেবশর্মাকে তার রাজ্যবর্ষের ২ এবং রাজবর্ষ ৩৫- এ দান করেছিলেন। বাণগড় থেকে প্রাপ্ত একটি শিলালিপি বালুরঘাট কলেজ সংগ্রহ শালায় সংরক্ষিত আছে। এই শিলা লিপিটি খোদিত হয় পাল রাজা নয় পালের ১৩ বছরের রাজত্বকালের ১০ম বছরে। ৬৮ সেমি লম্বা এবং ৪৮ সেমি চওড়া লিপিটির পাঠোদ্ধার করেন বালুরঘাট কলেজের অধ্যাপক অচিন্ত্যকৃষ্ণ গোস্বামী। মূল বাণগড়ে খননকার্য হলেও বাণগড় সংলগ্ন শিববাটিতে যেখানে দুর্বাসা সম্প্রদায়ের গোলগীর মহামঠ ছিল সেখানে কোনরূপ খনন কার্য এখনও শুরু হয়নি। এখানে দুটি বড় বড় শিবমন্দির তৈরির তথ্য ইতিহাস স্বীকৃত। একটি তৈরি করেছিল কম্বোজ বংশীয় নরপতি দ্বিতীয় বিগ্রহ পালকে পরাজিত করে। সময় আনুমানিক ৯৭২-৭৭ শতক। দ্বিতীয়টি তৈরি করেছিলেন মহীপালদেব ভিন্নদেশীয় রাজার কাছ থেকে গৌড় বরেন্দ্রভূমি উদ্ধার করে। সময় আনুমানিক ৯৭৭-১০২৭ শতকের মধ্যে।

লোসংস্কৃতিতে এই বিশ্বাস ও প্রচার রয়েছে যে, শিবের শ্রেষ্ঠ ভক্ত বাণরাজার উপাস্যদেবতা শিবের অধিষ্ঠান ক্ষেত্র এখানেই ছিল, যার জন্য এই স্থানের নাম শিববাটি। বাণগড়ের পাশে শিববাড়িতে আছে দ্বাদশ শতাব্দীর শিবমন্দির। হরিরামপুর থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে বৈরাট্টা গ্রামে প্রাচীন ইটের তৈরি বাড়ি ও মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায় এখানে রয়েছে বড় বড় দিঘী। জনশ্রুতি বৈরাট্টা নাকি বিরাট রাজার বিরাট নগর ছিল। দিঘী গুলির নাম খারিকা দিঘী, আলতা দিঘী, মালিয়ান দিঘী, বংশীহারী দিঘী, জোড়দিঘী, ধুমসা দিঘী, নীলসম্বার দিঘী ইত্যাদি। কুশমন্ডিতে আছে মহিপাল দিঘী। দ্বিতীয় মহিপালের নামানুসারে দিঘীটির নামকরণ করা হয়। গঙ্গারামপুর রয়েছে কালদিঘী, ধলদিঘী নামে দুটি ঐতিহাসিক দিঘী। অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন গঙ্গারামপুরের পীরপাল গ্রামের বুড়া পীরের সমাধিটি বখতিইয়ার খিলজীর। নারই- এ রয়েছে আসাম অভিযানকারী মোঘল সৈন্যদের ছয়টি পাকা কবর। তপন দীঘি হল দক্ষিণ দিনাজপুরের দীর্ঘতম দিঘী। কথিত আছে বাণ নামে কোনো রাজা তপন দীঘিতে তর্পন করতেন। তপন থানার ভিকাহারে মকদুম শাহ জালালের একটি প্রাচীন দরগা আছে। পতিরামে রয়েছে বিদ্যেশ্বরী মন্দির। বিদ্যেশ্বরী মন্দিরকে দেবী সতীর ৫১তম পীঠ বলে স্থানীয় মানুষ মনে করেন। বালুরঘাটে রয়েছে অঘোরী বাবার মন্দির, এখানে সাধক অঘোরী বাবার দেহ সমাধিত। বালুরঘাট থানার একটি গ্রাম 'বটুন'। অনেক গবেষক মনে করেন 'বটুন' কবিরত্ন সন্ধ্যাকর নন্দীর জন্মস্থান। দক্ষিণ দিনাজপুরেই রচিত হয়েছে পালও সেন যুগের প্রামাণ্য দলিল 'রামচরিত' গ্রন্থ। গঙ্গারামপুরের বর্তমানে 'উদয়পাঁচগা' গ্রামই হল জগজ্জীবন ঘোষাল উল্লিখিত 'কুচিয়ামাড়ী' গ্রাম। এখানেই রচিত হয়েছিল জগজ্জীবন ঘোষালের বিখ্যাত 'মনসামঙ্গল' কাব্য। কুশমন্ডী থানার করণজি গ্রামকে কোনো কোনো ঐতিহাসিক ধর্মপালের রাজধানী বলে মনে করেন। হরিরামপুরের বৈরাট্ট গ্রামে মহাভারতের বিরাট রাজার কাছারী বাড়ি ছিল। বৈরাট্টাতেই রয়েছে প্রাচীন শমীবৃক্ষ। এই বৃক্ষকে কেউ কেউ তমাল বৃক্ষ বলে তবে বৃক্ষটির প্রাচীনত্ব নিয়ে কোনো সংশয় নেই। জনশ্রুতি পান্ডবরা বিরাট নগরে প্রবেশের সময় তাদের অস্ত্রশস্ত্র শমীবৃক্ষে লুকিয়ে রেখেছিল। জেলার সীমান্ত ভাতশালাতে রয়েছে পাল ও সেন পরবর্তী মুসলিম যুগের প্রত্নক্ষেত্র।

‘‘প্রাচীন ভারতবর্ষে যে গৌড়ীয় রীতির বিকাশ হয়েছিল সেই জ্ঞানভূমির সন্ধান আমরা পাই বৃহদ্বটু নামক জায়গায়।’’[১৮]

বৃহদ্বটু অর্থে বড় বড় ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারীরা যে স্থানে বসবাস করত। বৃহদ্বটুর পরবর্তী নাম হয় স্কন্দ নগর। ‘‘স্কন্দ গুপ্ত বিক্রমাদিত্যের পরবর্তী জন্মস্থান হওয়াতেই যে বৃহদ্বটুর অন্য নাম স্কন্দনগর হয়েছিল...।’’[১৯]

পুনর্ভবা নদীর তীরে বাণগড়ে বা দেবকোট থেকে সরাসরি দিকে ১৫-১৬ মাইল পর রয়েছে আত্রেয়ী নদী। আত্রেয়ী নদীর পূর্ব দিকের অঞ্চল যার বর্তমান পতিরাম নাম। সেই স্থানই পূর্বের স্কন্দনগর বা বৃহদ্বটু। গঙ্গারামপুরে ছিল গৌড়ের প্রথম রাজধানী, বাণগড়, হরিরামপুরে ছিল গৌড়ের দ্বিতীয় রাজধানী রামাবতী, পতিরামে ছিল প্রাচীন গৌড়ের জ্ঞানভূমি, আরণ্যক সভ্যতার উৎসভূমি। দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাট দিয়ে প্রবাহিত আত্রেয়ী শব্দের উৎপত্তি হয়ত ‘ঐতেরেয়’ শব্দের মধ্যে লুকিয়ে আছে। ঐতেরেয় আরণ্যক বা ঐতেরেয় ব্রাহ্মণ যে নদীর তীরে বসে আর্য ঋষিরা রচনা করেছিলেন সেই নদীই আত্রেয় থেকে লিঙ্গভেদে আত্রেয়ীতে পরিণত হয়েছিল। এছাড়া ও দক্ষিণ দিনাজপুরের সর্বত্র পুরাতাত্বিক উপাদান ছড়িয়ে রয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের পর্যটন মানচিত্রে দক্ষিণ দিনাজপুরের নাম খুঁজে পাওয়া যাবে না। তবে দক্ষিণ দিনাজপুরে পর্যটন শিল্পের সম্ভনা রয়েছে। বংশীহারীর বৈরাট্টা গ্রাম। তপনের ভাইওয়র মায়ের থান, বালুরঘাটের বোল্লা কালীমন্দির, লস্কর হাটের পাঁচপুকুরের মেলা, জলঘরের ত্রিকূল মেলাকে কেন্দ্র করে প্রচুর বাইরের লোকের সমাগম হয়। গঙ্গারামপুরের বাণগড়, কালদিঘী, দলদিঘী, হরিরামপুরের আলতা দিঘী, মালিয়ান দিঘী, তপনের তপন দিঘী, মহিপালের নীলকুঠি (উইলিয়াম কেরীর নাম যুক্ত) - এই সমস্ত কিছু পর্যটকদের আকর্ষণ করতে পারে।

একদা সংস্কৃতির কেন্দ্র বালুরঘাটে নাটককার ড. মন্মথ রায়ের বসত বাড়িতে মন্মথ রায় সংস্কৃতি চর্চাকেন্দ্র এবং আলাদাভাবে রয়েছে ‘‘মন্মথ রায় স্মৃতি ভবন’’। এখানে রয়েছে তিনটি নাট্যমঞ্চ , একটি রবীন্দ্রভবন, রয়েছে সত্যাজিৎ মঞ্চ, একটি মিউজিয়াম ও সমৃদ্ধ জেলা গ্রন্থাগার। বাংলাদেশে মুক্তি যুদ্ধের সময় দক্ষিণ দিনাজপুর তথা বালুরঘাট সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিল। জয়ের স্মৃতি চিহ্ন হিসাবে তারা পাকিস্থানের ব্যবহৃত ‘প্যাটন ট্যাঙ্ক ছিনিয়ে আনে এবং সেটা (প্যাটন ট্যাঙ্ক) বালুরঘাটে সংরক্ষিত আছে। বালুরঘাটের মানুষ নাট্যে, কাব্যে, স্বাধীনতা সংগ্রামে ও সংস্কৃতিতে তথা সমাজ সেবায়, রাজনীতিতে ও মানব কল্যাণ মূলক ও ধর্ম চেতনায় এগিয়ে ছিল। বালুরঘাটে ভারত সেবাশ্রম সংঘ, রামকৃষ্ণ মিশন, সৎ সংঘ, লোকনাথ মিশন এবং গৌড়ীয় মঠের কার্যকলাপে ধর্ম পথে নবজাগরণ সৃষ্টি করছে বলা যায়।

পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলার অগ্রগতির নিরীখে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা অত্যন্ত

অনুন্নত হলেও নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকে না। নানা বিদ্রোহ জেলায় সংঘটিত হয়েছে। পাল যুগে দিব্যের নেতৃত্বে কৈবর্ত বিদ্রোহ পাল সাম্রাজ্যের ভিতকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। ফকির বিদ্রোহ (১৭৬৩-৭৮) থেকে শুরু করে ছত্রিশ জাতির আন্দোলন (১৯২১-২৭), গাছকাটা আন্দোলন (১৯২৪-২৫), খাজনা বন্ধ আন্দোলন (১৯৩২) ও আধিয়ার আন্দোলন দিনাজপুরের মানুষকে অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে শিখিয়েছিল। স্বাধীনতা আন্দোলনে দক্ষিণ দিনাজপুর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিল। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় বালুরঘাট তীব্র প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। বালুরঘাটের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন দ্রুত শহর অতিক্রম করে সমগ্র জেলাতে ছড়িয়ে পড়ে। বালুরঘাটে বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই জনসভায় সভাপতিত্ব করেন ড. চন্দ্রকান্ত চট্টোপাধ্যায়। ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দে ১৬ অক্টোবর বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে অরন্ধন দিবস পালিত হয় এবং স্বদেশী ভান্ডার খোলা হয়। ভারতের জাতীয় আন্দোলনের মূল ধারা থেকে এই জেলা কখনও পিছিয়ে থাকেনি। মহাত্মাগান্ধী, বিপিনচন্দ্র পাল, চিত্তরঞ্জন দাস, সুভাসচন্দ্র বোস, জহরলাল নেহেরু, মুকুন্দ দাস, পদ্মজা নাইডু বিভিন্ন সময়ে এই জেলায় এসেছেন। ১৯২৮ খ্রিষ্টাব্দে সুভাষ চন্দ্র বসু বালুরঘাটে আসেন এবং বালুরঘাটে জাতীয় কংগ্রেস ভবনের দ্বারোদ্‌ঘাটন করে যান। অসহযোগ (১৯২০), আইন অমান্য (১৯৩০), ভারতছাড়ো (১৯৪২), আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছে বালুরঘাট। ১৯৪২ এর বালুরঘাটের আন্দোলনের সূত্রধরে জেলার পারিলাহাট সংলগ্ন এলাকার সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে জড়িয়ে পড়েন স্বাধীনতা সংগ্রামীরা। এই লড়াই ৪জন যোদ্ধা শহিদ হয়েছিলেন।১৭জন আহত হয়েছিলেন। স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এটি পারিলাহাট সংগ্রাম' হিসেবে পরিচিত। দেশের মুক্তি সংগ্রামে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের এই আত্মত্যাগ জেলার ইতিহাসে বিরলতম ঘটনা। ১৮ই সেপ্টেম্বর এই লড়াই হয়েছিল তাই ১৮ই সেপ্টেম্বর দিনটিকে সরকারি ভাবে 'পারিলাহাট সংগ্রামী দিবস' হিসেবে পালনের দাবী তুলেছে প্রত্যুষ ও ইকো ফ্রেন্ডস্ অর্গানাইজেশন। স্থানীয় ইতিহাস ও প্রত্নতাত্বিক গবেষক সমিত ঘোষ দাবী তোলেন- '' এ প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের কাছে স্বাধীনতা সংগ্রাম, সংগ্রামীদের ইতিহাস তুলে ধরতে স্কুলস্তরের পাঠ্যপুস্তকে সেইসব অন্তর্ভুক্তি করা হোক। স্বাধীনতা সংগ্রামে অন্য জেলার ইতিহাস পাঠ্যপুস্তকে গুরুত্ব পেয়েছে। এ জেলার ইতিহাসও সেক্ষেত্রে সমান গুরুত্বপূর্ণ।''[২০]

বিপ্লবী আন্দোলনে এই জেলায় গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা রয়েছে। বিপ্লবী আন্দোলন প্রকাশ পেয়েছিল কতকগুলি ডাকাতির মাধ্যমে। স্বদেশী ডাকাতির মাধ্যমে বৃটিশ শাসন ক্ষতবিক্ষত করতে চেয়েছে। ১৯৩৩ সালে বিখ্যাত হিলি মেল ট্রেন ডাকাতি হয়, তপন থানার কাকনা গ্রামে ডাকাতি, বোল্লা গ্রামে ডাকাতি বিপ্লবী আন্দোলনে নতুন মাত্রাযোগ করে। বালুরঘাটে বিভিন্ন গুপ্ত সমিতির শাখাছিল যেমন - যুগান্তর, অনুশীলন, ব্রতী, স্বদেশ বান্ধব সমিতি। বালুরঘাটের খাঁপুরে সংগঠিত হয়েছিল রক্তক্ষয়ী তে-ভাগা আন্দোলন (১৯৪৬-৪৭ খ্রী:) ১৯৪৭ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী রাতে পুলিশের গুলিতে ২২ জন কৃষক-কৃষাণী মারা যান।

স্বাধীনতা আন্দোলনে জেলার নারীরা পিছিয়ে ছিল না। প্রভাবতী চ্যাটার্জী, বেলারানী চ্যাটার্জী, কুমুদকামিনী দেবী, রাজলক্ষ্মীশ্রী গুহ, সুমতি হালদার, অমিয়বালা রায়, ঘনোবালা সাহা, বিদ্যা পেশোয়ার, ইন্দুমতি দেবী প্রমুখ। বালুরঘাটে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আন্দোলনে

ছাত্রেরা সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিল। মূলত বালুরঘাট উচ্চবিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে ছেলেরা রাজনীতির অঙ্গনে প্রবেশ করেছিল। কংগ্রেসের রাজনীতিতে ছাত্রদের সক্রিয় ভূমিকা লক্ষ্য করা গিয়েছে। ''যাঁরা উচ্চ শিক্ষার জন্য রাজশাহী, রংপুর, পাবনা,ঢাকা কলেজে অথবা কোলকাতায় যেতেন সেখানে অনেক পরবর্তীতে অনুশীলন অথবা বেঙ্গল ভলানটিয়ারের নেতাদের যোগাযোগে বিপ্লবী কর্মকান্ডে লিপ্ত হয়েছেন।''[২১]

১৯৪২ সালে আগষ্ট আন্দোলনকে কেন্দ্র করে ছাত্র আন্দোলনের জোয়ার দেখা দিয়েছিল। এই সময়ে সুভাষ চন্দ্র বসুর ফরওয়ার্ড ব্লক যেমন ছিল তেমনি ছিল আর. এস.পি. এবং সি.পি.আই. দলের অনুরাগীরা। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে বালুরঘাটের ছাত্র সমাজ বামপন্থী ছাত্র সংগঠনের দিকে ঝুকে। দিলীপ ধর, মুকুল বসু, সত্য চক্রবর্তী, বিশ্বনাথ ঘোষ আর. এস.পি. এর ছাত্র আন্দোলনের নেতা এছাড়াও ছিলেন দীপঙ্কর ব্যানার্জী, অরূপ ভট্ট াচার্য, কালী কর, ক্ষিতি গোস্বামী, দেবরঞ্জন ভট্টাচার্য। ১৯৫৪ সালে এ.বি.টি.এ. এর নেতৃত্বে ঐতিহাসিক শিক্ষক আন্দোলন হয় সেখানে বালুরঘাটের ছাত্র সমাজ গর্জে উঠেছিল। ১৯৫৯ সালে খাদ্য আন্দোলনে যোগ দেয় বালুরঘাট কলেজের অনেক ছাত্রনেতা ও কর্মী।

১৯০১ সালে বালুরঘাটে প্রতিষ্ঠিত হয় 'বালুরঘাট টাউন ক্লাব'। উদ্যোগতাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন ডাক্তার অমূল্যরতন চক্রবর্তী, সুরেশ রঞ্জন চ্যাটার্জী, রসিক লাল গুহ প্রমুখ। তখন বালুরঘাটে খেলা ধুলাও ছিল সচ্ছল ব্যক্তিদের মধ্যে। সে সময়ে বিনোদনের অন্য কোনো মাধ্যম না থাকায় খেলা নিয়ে মাতামাতি ছিল দারুণ। ১৯০৪ সালে বালুরঘাট দিনাজপুর জেলার মহকুমা শহরে উন্নীত হলে বিভিন্ন পেশার লোক বাইরে থেকে বালুরঘাটে আসেন। এই সময়ে পরিবর্তনের ঢেউ লাগে বিভিন্ন ক্ষেত্রে। খেলা ধুলাতেও একটা জোয়ার আসে। ১৯২১ সালে ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাব গঠিত হয়। এইপর গঠিত হয় 'অনন্ত স্পোটিং ক্লাব'। দেশভাগের পর ১৯৫২ সালে 'জেলা ক্রিয়া সংস্থা' গঠিত হয়। বালুরঘাট স্পোটিং, নেতাজী স্পোটিং ক্লাব, আমরা ক'জন ক্লাব, পূর্ব্বশা, বিপ্লবী সংঘ, অভিযাত্রী ক্লাব, কবিতীর্থ ক্লাব, কচিকলা একাডেমি ইত্যাদি বালুরঘাটের ফুটবল চর্চাকে ধরে রেখেছে। একসময় বালুরঘাটে জনপ্রিয় খেলা ছিল ফুটবল। ফুটবল ছাড়াও লন- টেনিস, টেবিল-টেনিস, ব্যাডমিন্টন, ভলিবল, ক্যারাটে, প্রভৃতি খেলাও জনপ্রিয় হয়েছে। বালুরঘাটে একটি ছোট কিন্তু সুংসহত স্টেডিয়াম রয়েছে।

'সংস্কৃতি' শব্দটির একটি ব্যাপক ব্যঞ্জনা আছে। সাহিত্য, নাটক, নৃত্য, শিল্প সব সৃজনশীল তাই এই শব্দটির মধ্য বিদ্যমান। এর সঙ্গে থাকে সমাজ, কাল, পুরাতত্ত্ব লোক সমাজের আশা আকাঙ্খা, আচার-আচরণ, বিশ্বাস সকলেই সংস্কৃতির মধ্যেই পড়ে। দক্ষিণ দিনাজপুরের লোক সংস্কৃতির ভান্ডার বিরাট এবং নানা রসদে পূর্ণ। সংস্কৃতি বাস্তব প্রয়োজনে জন্মায় এবং জীবন যাত্রার বাস্তব উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে। সংস্কৃতির রূপ-রঙও পাল্টায় সময়ে সময়ে। সামাজের ধারাবাহিক অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে লৌকিক আচার অনুষ্ঠান গুলোও হয়ে ওঠে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সার্বজনীন ও অঞ্চলভিত্তিক। সংস্কৃতি মানুষকে সহনশীল করে তোলে। সংস্কৃতি হচ্ছে শিক্ষা বা চর্চার দ্বারা লব্ধ উৎকর্ষ বা কৃষ্টি। আর লোকসংস্কৃতি হল লোক সমাজের সম্যক সৃষ্টি। দক্ষিণ দিনাজপুরের সর্বত্র লোক সংস্কৃতির বিরাট ভান্ডার রয়েছে।

বিয়ের গান, মুখোশ, লৌকিক খেলাধুলা, প্রবাদ-প্রবচন, ঝাড়ফুঁক, ওঝা, আলপনা প্রভৃতি লোক সংস্কৃতির অঙ্গ ছড়িয়ে রয়েছে সর্বত্র। এছাড়াও লোক নাটক 'খন' নাটক হল দক্ষিণ দিনাজপুরের জনপ্রিয় লোক নাটক। লোক নাটকের মধ্যে থাকে শিল্পের ছোঁয়া আছে। 'খন' লোক নাটকের মধ্যে সমসাময়িক ঘটনার অদ্ভুদ প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়। মানুষের জীবনের হিসেব প্রতিচিত্রিত হয়ে ওঠে 'খন' লোক নাটকের মধ্যে। ঘরের দর্পণ নিজের মুখের জন্য, লোক নাটক সমাজের লোকের দর্পন। 'খন' লোক নাটকের চাষী গোঁসাই, শিষ্য, ভায়রা, নাপিত, পীরের সেবক প্রভৃতি মানুষের পরিচয় আছে। লক্ষ্মীর গান, বিষহরা, হালুয়া-হালুয়ানী, চোর-চুরণী, আলকাপ, যুগীগান, চোর-চুরণী গান, গমীরা প্রভৃতি দক্ষিণ দিনাজপুরে প্রচলিত। লোকগানের পরিধি বিস্তৃত। লোকগান হিসেবে শোনায় যায় - বিষহরা গান, রামবন রাম গান, সত্যপীরের গান, হমাতা গান, জল মাঙ্গার গান, তে-ভাগার গান, চড়কের গান, মহীপালের গান প্রভৃতি। এছাড়াও আছে আদিবাসী সমাজে - দাঁসাই, সহরায় গান, গুঞ্জার গান, করম গান, বিয়ের গান এবং মসুলিম সমাজ আছে মারফতী গান, জংগান প্রভৃতি। জেলার মোখানাচ এক অন্যন্য যশোগাথা। দক্ষিণ দিনাজপুরের বংশীহারী, কুশমন্ডি, ও হরিরামপুর এই তিনটি থানা লোক সংস্কৃতির অঙ্গনে মুখোশ নাচ (মুখানাচ) ও মুখোশ তৈরিতে শুধু পশ্চিমবঙ্গে নয় দেশ-বিদেশে এক উজ্জ্বল শিল্প সৌকর্যের স্বাক্ষর রেখে চলেছে। ''পুনর্ভবার পশ্চিম পাড়ের যে রাজবংশী সমাজ (বংশীহারী সহ) সেই সমাজের প্রধান উৎসব মখা খেইল বা মুখোশ নাচ। এই মখা খেইল মহাউৎসবে পৌঁছে যায় 'গমিরা' বুড়ির পূজা ও মেলার মধ্যে দিয়ে''[২২]। ঢাকের গম্ভীর শব্দ সহযোগে যে মুখোশ নাচ তাই গমিরা।

পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতিতে বালুরঘাটের একটি বিশেষ স্থান আছে। বালুরঘাট মিশ্রবিত্তের বাস। চাকরীর প্রয়োজনে আসা বহিরাগতের সংখ্যা যথেষ্ট। এখানে নাটক; সাহিত্য, আবৃত্তি, অঙ্কন সবকিছুই আবর্তিত হচ্ছে মধ্যবিত্তের মধ্যে। বালুরঘাটের প্রথম সাংস্কৃতিক চর্চা নাটক দিয়ে। বালুরঘাটের সাহিত্যচর্চা লক্ষনীয়। জেলা পরিষদ, জেলা গ্রন্থাগার, প্রেসক্লাব ইত্যাদি স্থানে এবং কবি সাহিত্যিকদের বাড়িতে সাহিত্য আড্ডা বসে সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক হিসেবে। দেশ বিভাগ থেকে শুরু করে বাংলাদেশ মুক্তি যুদ্ধের সময় বহু মানুষ পূর্ববঙ্গ থেকে এদেশের নিরাপদ আশ্রয়ের আশায় আসেন। দক্ষিণ দিনাজপুর সীমান্ত জেলা, এখানে উদ্বাস্তুর সংখ্যা ছিল সব থেকে বেশি। বস্তুত দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাকে উদ্বাস্তু জেলা বলেও অত্যুক্তি হয় না। জীবিকার সন্ধানে জীবন সংগ্রামে লিপ্ত মানুষের কাছে সৃষ্টির অবকাশ ছিল না। এখানকার প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার পর সাহিত্যচর্চার তাগিদ অনুভূত হয়। এরই প্রতিফলন হিসেবে সাহিত্যসভা ও পত্র-পত্রিকার উন্মেষ ঘটে। সৃজনশীল মানুষের কাছে এই দুইটিই হল প্রকাশের প্রধান মাধ্যম। ক্রমে বালুরঘাটের মাটিতে প্রতিভাবান সাহিত্যিকের জন্ম ঘটেছে। নাটককার ড. মন্মথ রায়, অভিনেতা, পরিচালক নাটককার হরিমাধব মুখোপাধ্যায় বঙ্কিম পুরস্কার প্রাপ্ত উপন্যসিক ও গল্পকার অভিজিৎ সেন, কবি নীরদ রায় বাংলার সর্বত্র পরিচিত। অধ্যক্ষ ড. অতুল চন্দ্র চক্রবর্তী ছিলেন প্রাবন্ধিক, গল্পকার ও উপন্যাসিক। বদরী প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, কালিদাস ভট্টাচার্য, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় অধ্যাপক বিমান সরকার, কবি মুকুল বসু, শ্যামল কুমার ঘোষ, অচিন্ত্য কৃষ্ণ গোস্বামী, কালী কর, সন্তোষ সাহা, শিবানী রায়, শিপ্রা চট্টোপাধ্যায়, হরিমাধব মুখোপাধ্যায়, প্রাবন্ধিক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছেন। এছাড়া ও শুভ্রাংশু শেখর মৈত্র, মানবেশ চৌধুরী, মিহিরবরণ

মুখোপাধ্যায়, কমলেন্দু চক্রবর্তী, রাধা মোহন মহন্ত প্রমুখ বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখেছেন।

বালুরঘাটে উপন্যাস ও ছোট গল্পেরও বিস্তার রয়েছে। মনীন্দ্র নাথ সাহা, দেবেন ঘোষ, অজিতেশ ভট্টাচার্য, দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, অনিন্দ্য ভট্টাচার্য, নির্মলেন্দু তালুকদার, পীযুষ কান্তি মন্ডল প্রমুখ উপন্যাস ও ছোট গল্প রচনা করেছেন। তবে সমাজসেবি কৃষ্ণপদ মন্ডল ''রক্তে রাঙ্গা কার্গিল', 'রক্তাক্ত রায়নগর'', নামে দুটি ঘটনা বহুল বই লিখে বালুরঘাটের সাহিত্য জগতে সাহসের পরিচয় দিয়েছেন। এছাড়াও ধীরেন্দ্র নাথ কুন্ডু, প্রবীর চট্টোপাধ্যায়, মুকুল বসু, যীষ্ণু নিয়োগী, পীযুষ ভট্টাচার্য, মঞ্জুলা লাহিড়ী, অভিজিৎ চক্রবর্তী, শিবানী রায়, সুমনা ঘোষ প্রমুখ ছোট গল্প লিখে সাহিত্য ভান্ডার সমৃদ্ধ করেছে। কবিতা লিখেছেন মুকুল বসু, সরিৎ তোকদার, জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায়, পীযুষ ভট্টাচার্য, মৃণাল চক্রবর্তী, সঞ্জয় দত্ত, দীপঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবীর চৌধুরী, মনোরঞ্জন ঘোষ, পীযুষ কান্তি দেব, শুভেন্দু সমাজদার, রক্তিম সাহা, জয়শ্রী সাহা, উৎস রায় চৌধুরী, বিশ্বরূপ দে সরকার, মুনমুন দাস মন্ডল প্রমুখ।

দক্ষিণ দিনাজপুরের নাট্যচর্চা অনেক পুরনো। দক্ষিণ দিনাজপুরের নাট্যচর্চার প্রাণ কেন্দ্র বালুরঘাট। প্রাক্‌স্বাধীনতা পর্বে দক্ষিণ দিনাজপুরে দুটি সংস্থা ছিল-বালুরঘাট থিয়েট্রিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন (১৯০৯)> এডওয়ার্ড মেমোরিয়াল ড্রামাটিক ক্লাব এবং বোয়ালদাড় বারোয়ারী নাট্য সংস্থা (১৯৪২)। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে এডওয়ার্ড ড্রামাটিক মেমোরিয়াল হলের নাম হয় 'বালুরঘাট নাট্যমন্দির'। স্বাধীনতা পরবর্তীতে গ্রুপ থিয়েটার সূচনা পর্ব থেকেই বালুরঘাট প্রচুর নাট্য সংস্থা গঠিত হতে থাকে। বিশেষ করে 'বালুরঘাট নাট্যমন্দিরের সদস্যগণই বিশেষ বিশেষ সময়ে আলাদা নাট্যসংস্থা তৈরি করেছিলেন। বালুরঘাটের পুরনো যত অভিনেতা অভিনেত্রী তাঁরা সকলেই নাট্যমন্দিরের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে একের পর এক নাট্যসংস্থা তৈরি হল বালুরঘাটে। তাঁর মধ্যে কিছু নাট্যসংস্থা লুপ্ত হযেছে। আবার কিছু নাট্য সংস্থা নিষ্ঠা ও অধ্যাবসায় সহকারে নাটক পরিবেশন করে চলেছে। বহু পূর্ব থেকে বালুরঘাটে পাড়ায় পাড়ায় নাটক হত। মঞ্চ (বালুরঘাট নাট্যমন্দির মঞ্চ, গোবিন্দ অঙ্গন-কল্যান মঞ্চ, মন্মথ মঞ্চ) থাকা সত্ত্বেও পাড়ায় পাড়ায় নাটক হত। এবং বিজয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠানে নাটক ছিল অপরিহার্য। প্রতি শনিবার ও রবিবার বালুরঘাটে কোনো না কোনো সংস্থা নাটক প্রযোজনা করবেই। তাছাড়া সপ্তাহের অন্য বারেও নাটক হয়। বাইরের নাট্যসংস্থা বালুরঘাটে কল শো করে থাকে। যে সংস্থা গুলি এখনও নাটক প্রযোজনা করছে সেগুলি হল-'বালুরঘাট নাট্যমন্দির', 'ত্রিতীর্থ', 'নাট্যতীর্থ', তূণীর', 'বালুরঘাট নাট্যকর্মী', 'সমবেত নাট্যকর্মী', 'বালুরঘাট সৃজন' এবং ভারতীয় গণনাট্য 'শপথ' শাখা। আরো বহু সংস্থা ছিল যারা অল্প সময়ে সৃষ্টি হয়ে বালুরঘাটের রঙ্গ মঞ্চকে কিছু উল্লেখ যোগ্য উপহার (নাটক) দিয়ে লুপ্ত হয়েছে। যেমন-'তরুণতীর্থ', 'ত্রিশূল', 'লোকায়ন', 'যান্ত্রিক', 'প্রগতি', 'দর্পন', 'অভিযাত্রী', 'দিশারী', 'প্রাচ্যভারতী', 'সংকেত', 'আত্রেয়ী', 'যুক্তসংঘ', অগ্নিবীনা' প্রভৃতি। দক্ষিণ দিনাজপুরের প্রায় সর্বত্রই নাট্য সংস্থা রয়েছে-

দিশারী নাট্য সংস্থা	-	পতিরাম
যুবগোষ্ঠী	-	তিওড়
আনন্দ আশ্রম	-	হিলি

মিতালী	-	তপন
আনন্দ আশ্রম	-	তপন
রূপকার	-	গঙ্গারামপুর
ত্রিনয়ন নাট্যসংস্থা	-	গঙ্গারামপুর
অগ্নিবীনা	-	বংশীহারী
সংকেত	-	নয়াবাজার
ভাষা উন্নয়ন সংস্থা	-	কুশমন্ডী
তপ: জাতি উপ: জাতি সমিতি	-	কুশমন্ডি

বালুরঘাট নাট্যমন্দিরের উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা 'ঝুমুর', 'ছেঁড়াতার','ফেরারী ফৌজ', 'মারীচ সংবাদ', 'ফেরা', 'তাহার নামটি রঞ্জনা', 'কালামাটির কান্না' প্রভৃতি । ১৯৬৯ সালে পাটনা সারাভারত পূর্ণাঙ্গ নাটক প্রতিযোগিতায় 'ছেঁড়াতার' শ্রেষ্ঠ হয়। বালুরঘাট নাট্য মন্দিরের প্রযোজনায়। 'ত্রিতীর্থ' নাট্যসংস্থার সারাজাগানো নাটক 'গ্যালিলেও', 'তিন বিজ্ঞানী', 'ভাঙ্গাপট', 'দেবীগর্জন', 'জল', 'দেবাংশী' ইত্যাদি। 'ত্রিতীর্থও ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে নাটক প্রযোজনা করে নাম কুড়িয়েছে। বালুরঘাটের অভিনেতারা গন্ডিবদ্ধ স্থানে অভিনয় করে। তাঁদের অভিনয় প্রতিভা খুব বেশী প্রসারিত হয় না ঠিকই কিন্তু এখানেও পুরস্কার প্রাপ্ত অভিনেতা/অভিনেত্রী রয়েছে-হরিমাধব মুখোপাধ্যায়, রুমা নন্দী, তিনু বন্দ্যোপাধ্যায়, কমল দাস, নূপুর হোর, রেবা বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রদোষ মিত্র প্রমুখ অভিনেতা অভিনেত্রী পুরস্কার প্রাপ্ত।

'বালুরঘাট নাট্যমন্দির' থেকেই ড. মন্মথ রায় এতবড় নাটককার হয়ে গেলেন। ভারতের নাট্য জগতে ড. মন্মথ রায়ের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। অভিনেতা পরিচালক হরিমাধব মুখোপাধ্যায় নাটককার হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছেন। এছাড়াও নাটক লিখেছেন শুভ্রাংশু মৈত্র, নির্মলেন্দু তালুকদার, অমলেশ মিত্র, সত্যরঞ্জন তালুকদার, ভাস্কর চ্যাটার্জী, ভবেন্দু ভট্টাচার্য ও মনোজ গঙ্গোপাধ্যায়।

ছোট পত্রিকা যেন জন্মের পূর্বেই মৃত্যুর দিন ঠিক করে রাখে। দক্ষিণ দিনাজপুরের পত্র-পত্রিকা গুলি তা থেকে আলাদা নয়। এ জেলার সাহিত্য হোক আর পত্র পত্রিকাই হোক সমস্তই বালুরঘাট কেন্দ্রিক। বালুরঘাটের বাইরে কিছু প্রয়াস চোখে পড়লেও তেমন সাড়া জাগানো নয়। অবিভক্ত দিনাজপুর সংবাদ সাহিত্য পত্রিকা 'দিনাজপুর সংবাদ' সম্পাদক ছিলেন নট ও নাট্যকার শিব প্রসাদ কর। বালুরঘাট ১৯৫০- এর পরে প্রথম পত্রিকার আত্মপ্রকাশ। সম্পাদক রাধা মোহন মহন্ত 'আত্রেয়ী' নামে সাহিত্য মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। পরে পত্রিকাটি তাঁর সম্পাদনায় সংবাদ সাপ্তাহিক হিসেবে প্রকাশিত হত। সম্পাদকের মৃত্যুর পর পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। বিভিন্ন সময়ে বহু পত্র-পত্রিকার প্রকাশ হয়েছে, আবার তারা লুপ্ত হয়েছে। 'নবারুণ', কৃন্তন, প্রলয়, সঞ্চারিনী, নাবিক, প্রথম কলি, দধীচি, খুঁজে বেড়াই, চেতনা, মধ্যবর্তী, উত্তর দক্ষিণ, নাট্যচিন্তা নাট্যতীর্থ প্রভৃতি। পঞ্চাশের দশকে পত্রিকা 'বরেন্দ্রভূমি' অনেক ঝড় ঝাপটা সামলিয়ে এখনও বেঁচে আছে। এছাড়াও অন্যদিন, বালুরঘাট বার্তা, 'অনুসন্ধানী চোখ', সূর্যবীজ, বিবর্ণমুখোশ, পাক্ষিক, 'ওয়েষ্ট দিনাজপুর ডেসপ্যাচ' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। দক্ষিণ দিনাজপুরের অন্যান্য কয়েকটি পত্রিকা 'ত্রৈমাসিক উষাহরণ

(কুশমন্ডী), অকপট (গঙ্গারামপুর), মেঠোপথ (কুশমন্ডী), টাঙ্গন (বুনিয়াদপুর), মেহনতি জনগন (গঙ্গারামপুর) ইত্যাদি। পত্রিকার জগতে সাড়া জাগিয়ে ছিল ১৯৬৬তে প্রকাশিত 'মধুপর্ণী' পত্রিকা, সম্পাদক ড. সুধীর করণ। ১৯৬৯- এর সম্পাদক হন অজিতেশ ভট্টাচার্য। মধুপর্ণী ও ২০০৫ সালের পর আর প্রকাশিত হয়নি। তবে মধুপর্ণীর সংখ্যাগুলি যেন সমগ্র উত্তরবঙ্গের ইতিহাস বলে দেয়।

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার প্রবেশপথ:-

১. বাংলাদেশ থেকে হিলি হয়ে আন্তর্জাতিক পথ।

২. শিলিগুড়ি, রায়গঞ্জ, কালিয়াগঞ্জ, ফতেপুর হয়ে রাজ্যপথ।

৩. কোলকাতা, মালদহ, গাজোল, মেহেন্দিপাড়া হয়ে রাজ্যপথ

এছাড়া মালদহ, নালাগোলা, আমতলিঘাট হয়ে এবং ইটাহার, হরিরামপুর হয়ে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় প্রবেশ করা যায়।

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার প্রতিবেশী:-

পূর্বে-বাংলাদেশ, পশ্চিমে-মালদহ জেলা ও উত্তর দিনাজপুর জেলা, উত্তরে-বাংলাদেশ ও উত্তর দিনাজপুর জেলা, দক্ষিণে-বাংলাদেশ ও মালদহ জেলা।

রাজনৈতিক তথ্য:- এই জেলার একটি লোকসভায় আসন ৬নং বালুরঘাট, তবে হরিরামপুর থানার কিছু অংশ ৫নং রায়গঞ্জ লোকসভার কেন্দ্রের অন্তগর্ত। জেলায় রয়েছে ছয়টি বিধান সভার আসন ৪২নং হরিরামপুর, ৪১নং গঙ্গারামপুর, ৪০নং তপন (তপ: উপজাতি), ৩৯নং বালুরঘাট, ৩৮নং কুমারগঞ্জ, ৩৭নং কুশমন্ডি (সংরক্ষিত) জেলাটি বর্তমানে মালদা বিভাগের অন্তগর্ত।

তথ্যসূত্রঃ

১। স্মরণিকা ২য়বর্ষ, বাংলার মুখ ২৫শে ডিশেম্বর ২০০৩-৪ঠা জানুয়ারী ২০০৪, প্রকাশক বাংলার মুখ স্মরণিকা উপসমিতির পক্ষে শিশির ঘোষ (ববৃহত্তর বঙ্গীয় ইতিহাসাশ্রয়ে দিনাজপুর-ড.কমলেশ চন্দ্র দাস)

২। দক্ষিণ দিনাজপুরের পুরাকীর্তি, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও ইতিহাস-সমিত ঘোষ, প্রকাশনা শ্রী অধীর চন্দ্র পাল, অমর ভারতী, ৮সি ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯, পৃষ্ঠা-৬৫।

৩। দিনাজপুর জেলার ইতিহাস-ধনঞ্জয় রায়, প্রকাশক কে.পি. বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, ২৮৬-বি.বি. গাঙ্গুলী, স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০১২।

৪। বালুরঘাট বার্তা, শারদীয় সংখ্যা ১৪১৮, সম্পাদিকা মঞ্জুলা লাহিড়ী, মুদ্রণ-অটো প্যাকেজার্স অ্যান্ড প্রিন্টার্স, বালুরঘাট/দক্ষিণ দিনাজপুর। (দিনাজপুর প্রসঙ্গ-রণজিৎ কুমার সরকার)

৫। দিনাজপুর ১৭৫৭-১৯৪৭- ইন্দ্রজিৎ চক্রবর্তী, শুভাশীষ গুপ্ত, প্রকাশক ফ্রন্ট ব্লক, প্লট নং ৩০১, ৬৫ এ নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোষ রোড, টালিগঞ্জ, কোলকাতা-৪০।

৬। 'মধুপর্ণী', বিশেষ পশ্চিম দিনাজপুর জেলা সংখ্যা-১৩৯৯, মুদ্রাকর-লিপি মুদ্রণ,

৫২/১, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলকাতা-৯, পৃষ্ঠা-১৪৩।

৭। দিনাজপুর জেলার ইতিহাস-ধনঞ্জয় রায়, প্রকাশক কে.পি. বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী-২৮৬, বি.বি. গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০১২, পৃষ্ঠা ২৪২।

৮। বাঙ্গালীর ইতিহাস আদিপর্ব-নীহাররঞ্জন রায়, প্রকাশক সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং; ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭৩ সংযোজিত সাক্ষরতা সংস্করণ - ১৩৮৭, পৃষ্ঠা ১৪৮।

৯। দক্ষিণ দিনাজপুরের পুরাকীর্তি, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও ইতিহাস - সমিত ঘোষ, অমর ভারতী, ৮ সি ট্যামার লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃষ্ঠা ৬৭।

১০। 'মধুপর্ণী' বিশেষ পশ্চিম দিনাজপুর জেলা সংখ্যা-১৩৯৯, মুদ্রাকর লিপি মুদ্রণ, ৫২/১, সীতারাম ঘোষ, কলকাতা - ৯ (পশ্চিম দিনাজপুর জেলার উপভাষা-একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা - সুভাষ চন্দ্র রায় চৌধুরী)।

১১। দিনাজপুর জেলার ইতিহাস, ধনঞ্জয় রায়, প্রকাশক- কে. পি. বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী ২৮৬, বি.বি. গাঙ্গুলী স্ট্রিট, কলকাতা -৭০০ ০১২, পৃষ্ঠা ২৪৩।

১২। 'শারদীয় প্রত্যূষ', ১৪১৬, তথ্যে তথ্যে দক্ষিণ দিনাজপুর, প্রকাশনায় - ইকো ফ্রেন্ডস্ অর্গানাইজেশন, বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর, পৃষ্ঠা ৫৮।

১৩। দক্ষিণ দিনাজপুরের পুরাকীর্তি, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও ইতিহাস সহিত ঘোষ, প্রকাশক শ্রী অধীর চন্দ্র পাল, অমর ভারতী, ৮সি ট্যামার লেন, কলকাতা - ৭০০ ০০৯, পৃষ্ঠা ৬৫।

১৪। পূর্ববৎ পৃষ্ঠা- ২৬২।

১৫। মধুপর্ণী, বিশেষ পশ্চিম দিনাজপুর জেলা সংখ্যা ১৩৯৯, মুদ্রাকর-লিপি মুদ্রণ, ৫২/১, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলকাতা - ৯, পৃষ্ঠা - ১৩৬।

১৬। বাঙ্গালার ইতিহাস - 'প্রথম খন্ড', রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা-১৭৪।

১৭। 'বাংলার মুখ', স্মরণিকা ২য় বর্ষ, ২৫ ডিসেম্বর, ২০০৩ - ৪ জানুয়ারী ২০০৪ প্রকাশক বাংলার মুখ স্মরণিকা উপসমিতির পক্ষে শিশির ঘোষ। (বৃহত্তর বঙ্গীয় ইতিহাসাশ্রয়ে দিনাজপুর - ড. কমলেশচন্দ্র দাস)।

১৮। 'দক্ষিণ দিনাজপুর বার্তা', শারদ সংকলন ১৪২১, বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর। (ইতিহাস, ঐতিহ্য ও প্রাচীনত্বে এখন দক্ষিণ দিনাজপুর গৌড়-বরেন্দ্রত্বে শৈবাগম শাস্ত্রের উদ্ভবস্থল শিববাটি - ড. দেবব্রত মালাকার)।

১৯। পূর্ববৎ ।

২০। 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ' ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৮, পৃষ্ঠা -৯।

২১। 'সংবাদ দধীচি' ১৪১৪ সম্পাদক দীপংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, (ছাত্র আন্দোলনের উৎস সন্ধানে চপল রায়)

২২। দক্ষিণ দিনাজপুরের লোক সংস্কৃতি- দেবেশ গোস্বামী, প্রকাশক শ্যামল ঘোষ, ঘোষ পাপলিসিং কনসার্ণ, ৭৩ মহাত্মাগান্ধী রোড, কলকাতা - ৯, প্রথম প্রকাশ-২০১৭, পৃষ্ঠা - ৪২।